একুশ শতকের সাক্ষরতা ভাবনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

সাক্ষরতা হলো- পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। অর্থাৎ সাক্ষরতা বলতে লিখতে, পড়তে, গণনা করতে ও যোগাযোগ স্থাপন করার সক্ষমতাকে বোঝায়। এর সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করতে জানা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ বছরের পরিসংখ্যান মতে,দেশের মোট জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। এর মধ্যে ৮ কোটি ১৭ লাখ পুরুষ ও ৮ কোটি ৩৩ লাখ নারী আর ১২ হাজার ৬২৯ জন তৃতীয় লিঙ্গ। প্রতিবেদনে সাক্ষরতার হারের হিসেবে বলা হয়, দেশের নারী-পুরুষ মিলে মোট সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
সাক্ষরতার হার নিয়ে তুলনামূলক একটা চিত্র দেখা যেতে পারে-

ক্রমিক	দেশের নাম	সাক্ষরতার হার	পুরুষের সাক্ষরতার হার	নারীর সাক্ষরতার হার	বৈষম্য
১	পৃথিবী	৮৪.১%	৮৮.৬ %	৭৯.৭ %	৮.৯%
২	পাকিস্তান	৫৫%	৬৭%	৪২%	২৫%
৩	নেপাল	৬৬%	৭৫.১%	৫৭.৪%	১৭.৭%
৪	মালদ্বীপ	৯৯%	৯৯%	৯৯%	০%
৫	ভারত	৭৪.৪%	৮২.১%	৬৫.৫%	১৬.৬%
৬	বাংলাদেশ	৭৪.৬৬	৭৬.৫৬	৭২.৮২	৩.৭৪%
৭	জাপান	৯৯%	৯৯%	৯৯%	০%

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী- দেশে ১৯৭১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ ভাগ। ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ দশমিক ৩ এবং ২০০১ সালে ৪৭ দশমিক ৯। ২০০৮ সালে ৪৮ দশমিক ৮ ভাগ এবং ২০০৯ সালের হিসাবে ৫৩ ভাগ। ২০১০ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। এই হার ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ছিল ৫১.৭৭ শতাংশ। ২০২২ সালে এ হার ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ ছুঁয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাকির হোসেন এমপি।

এ বছরের প্রতিবেদনে আরো দেখানো হয়েছে, গ্রামের চেয়ে শহরে সাক্ষরতার হার বেশি। জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী পল্লী এলাকার মোট সাক্ষরতার হার ৭১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ২৯ শতাংশ, নারীদের সাক্ষরতার হার ৬৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এছাড়া শহর এলাকায় মোট সাক্ষরতার হার ৮১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮৩ দশমিক ১৮ শতাংশ, নারীদের ৭৯ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫৫ দশমিক ২৮ শতাংশ।

২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগের ঘোষণা ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। ২০১০ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে।কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশে এখনও ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি সাড়ে ১২ লাখ। সরকারি হিসাবে এক বছরে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে দশমিক ৯ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উদযাপিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের গতবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'মানব-কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের জন্য সাক্ষরতা: ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস' (লিটারেসি ফর আ হিউম্যান-সেন্টার্ড রিকভারি : ন্যারোয়িং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড)। এ বছরের

প্রতিপাদ্য হলো: 'ট্রান্সফরমিং লিটারেসি লারনিং স্পেসেস' যা বাংলায় 'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার'। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরের সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে।
এই যে দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোক এখনো নিরক্ষর এ দায়ভার কার বা কিভাবে শতভাগ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা সম্ভব? বিগত ৫০ বছরের চেষ্টার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ৯৯% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্যোগী, পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীকে দায়িত্ব নিতে হবে পুরোভাগে। সরকারি সাহায্য, বেতন, অনুদান ইত্যাদি পেতে হলে তার পরিধিতে থাকা নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে স্বউদ্যোগে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণও একটি বড় চ্যাপ্টার। যে কোন পর্যায়ে নমিনেশন পেতে হলে শর্ত হিসেবে নিজের এলাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেবিশ্বের এমন দেশগুলোর অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। আমি যতটুকু জানি বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি চাকরি বাকরি, সুযোগ-সুবিধা নিতে গেলে ওই ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সামনে আনা হয়। যেমন ধরুন, একজন চাকরি প্রার্থী। সামাজিক দায়বদ্ধতা অংশে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে এ চাকরি বা সুবিধার জন্য সামাজিক কি কি দায়িত্ব পালন করেছে? সে কাউকে শিক্ষিত করতে বা কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করতে বা কোন চ্যারিটি কাজে যুক্ত আছে কি না? সরকারি সুবিধা গ্রহণেচ্ছু যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে এমন জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। সামাজিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধনে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকারি/বেসরকারি চাকরির পদোন্নতিতেও বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা যায়। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের নাগরিককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নিজ উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশীকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। বাসার বা কারখানার শ্রমিককে শিক্ষিত করার দায়িত্ব মালিককেই গ্রহণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে দেশে একাধিক বার শতভাগ শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য পূরণে গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন নিয়েও গণমাধ্যমে লেখা দেখা যায়। আবার সাক্ষরতায় নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতেও পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সামাজিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে আঁধার থেকে আলোতে উদ্ভাসিত হোক-এটাই আজকের প্রত্যাশা। -পিআইডি ফিচার

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।
faruque_dewan@yahoo.com,